এই পরিচ্ছেদের প্রথমে মাস্টারমশাই দক্ষিণেশ্বরের একটি অতি সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রটির বৈশিষ্ট্য এই যে, মহাপুরুষের সান্নিধ্য থাকায় প্রাকৃতিক জড় সৌন্দর্যের ভিতরে যেন একটি দিব্য-চেতনার সঞ্চার হয়েছে। পূতসলিলা দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার বর্ণনা ক'রে, মাষ্টার মশাই বলছেন, খরস্রোতা গঙ্গা যেন সাগরসঙ্গমে পৌঁছবার জন্য কত ব্যস্ত! ভাবটা হচ্ছে এই যে, এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে যাঁরা আসছেন, তাঁরাও তাঁদের গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য, অর্থাৎ তাঁদের ইষ্টের সঙ্গে মিলনের জন্য যেন সেইরকম ব্যস্ত!

'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা' বিচার

তারপর মণিমল্লিকের কথা উঠল। তিনি কাশীতে দেখে এসেছেন একজন সাধুকে। সাধুটি বলেছেন, "ইন্দ্রিয়সংযম না হ'লে কিছু হবে না। শুধু 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করলে কি হবে?" ঠাকুর বলছেন, "এদের মত কি জানো? আগে সাধন চাই—শম, দম, তিতিক্ষা চাই। এরা নির্বাণের চেষ্টা করছে। এরা বেদান্তবাদী, কেবল বিচার করে, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—বড় কঠিন পথ।" এরপরই ঠাকুর দর্শনের একটি সূক্ষ্ম কথা বলছেন, "জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা।" এই কথাটির আলোচনা হয়েছে অনেক শাস্ত্রে। জ্ঞানী বলেন, 'জগৎ মিথ্যা।' কিন্তু 'জগৎ মিথ্যা' মানে যে-অবস্থায় আমরা রয়েছি, সেই অবস্থায় মিথ্যাত্ব আসছে না। যতক্ষণ আমাদের 'আমি' ব'লে বোধ রয়েছে, 'আমি'র অনুভূতি রয়েছে, ততক্ষণ জগৎটাকে মিথ্যা স্বপ্নবৎ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। জগতের সমস্ত জিনিসেরই দরকার হচ্ছে, লোকব্যবহার—সর্বসাধারণে যেমন করে,

তা-ই করছি, আর মুখে বলছি, 'জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ'—এতে কথায় এবং কাজে কোন মিল থাকে না। তাই ঠাকুর বলছেন যে, যদি জগৎ মিথ্যা হয়, তাহলে ও-কথা যে বলছে সেও মিথ্যা, তার কথাটাও মিথ্যা।

এই 'মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব' নিয়ে বেদান্তে আলোচনা আছে খুব। অতি সূক্ষ্ম আলোচনা। সে আলোচনা এখানে আমাদের করবার প্রয়োজন নেই। সূক্ষ্মভাবে শাস্ত্রচর্চা সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। তবে ঠাকুরের কথার তাৎপর্য আমরা বুঝতে চেষ্টা ক'রব। ঠাকুর বলছেন, যে 'জগৎ মিথ্যা' বলছে, সে কি জগতের অন্তর্ভুক্ত নয়? যদি সে জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেও মিথ্যা। আর সে যদি মিথ্যা হয়, তার সব কথাও মিথ্যা। সুতরাং তার 'জগৎ মিথ্যা' এই কথাটাও মিথ্যা হ'ল। কিন্তু 'জগৎ মিথ্যা' কথাটা তো মিথ্যা নয়। অতএব 'জগৎ মিথ্যা' ও-রকম ক'রে বলা যায় না। তবে বেদান্ত যে বলেন, 'জগৎ মিথ্যা', তার কারণ একটি উচ্চতর ভূমিতে দাঁড়িয়ে নিম্নের ভূমিকে মিথ্যা বলা যায়। যতক্ষণ আমি 'রজ্জু-সর্প' দেখছি—দড়িটাকে সাপ ব'লে দেখছি—ততক্ষণ সত্য-সাপ দেখলে যে-রকম অনুভব হয়, ঠিক সে-রকম অনুভবই হচ্ছে। সাপ দেখলে যে-রকম ভয় হয়, সে-রকম ভয় হচ্ছে। সুতরাং সেই অবস্থায় সাপটা মিথ্যা হচ্ছে না। সাপটা যদি মিথ্যা হ'ত, তাহলে ভয় হ'ত না। মিথ্যা সাপ দেখলে ভয় হয় না। সাপের চিত্র দেখলে ভয় হয় না। কিন্তু এখানে রীতিমত ভয় হচ্ছে। দেখে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছি, হৃৎকম্প হচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থায় সাপটি একান্ত সত্য। এই সত্যকে আমরা মিথ্যা ব'লে এড়াতে পারি না। কিন্তু যখন আমাদের রজ্জুর জ্ঞান হয়, যখন দড়িটাকে জানতে পারি, তখন বলি যে, ওটা দড়ি—সাপ নয়। তাহলে দড়ির জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ঐ সাপটি মিথ্যা হয় না। এইটি বিশেষরূপে জানবার জিনিস। অর্থাৎ ব্রহ্মকে না জানা পর্যন্ত জগৎ মিথ্যা হয় না।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগতে আমরা রয়েছি, ব্যবহার করছি, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে গ্রহণ করছি এবং সাধারণ লোকের মতো আগ্রহ করেই গ্রহণ করছি, ততক্ষণ এই জগৎকে মিথ্যা বলা প্রহসন মাত্র। এতে কথায় এবং কাজে একেবারেই মিল থাকে না। জগৎটাকে মিথ্যা বলতে পারি তখনই, যখন আমাদের এই জগতের প্রতি বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ থাকবে না। একটা জায়গায় কি একটা চকচক করছে। তাকে যদি জানি যে, ওটা ঝিনুকের খোলা, রূপো নয়, যদিও রূপোরই মত চকচক করছে, তাহলে আমরা সেই রূপোর পেছনে ছুটব না, সেটি পেতে চেষ্টা ক'রব না। কিন্তু যখন রূপো ব'লে মনে করছি এবং নেবার জন্য ছুটছি, তখন আর ওটা 'রূপো নয়, ঝিনুকের খোলা' এ-কথাটা বলা সাজে না।

আমাদের শাস্ত্র বলছেন, জগৎটা ব্যবহারকালমাত্রস্থায়ী। যেমন ঐ দড়িতে সাপটা। যে সাপটাকে দড়িতে দেখছি ভুল ক'রে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেখছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা আমার কাছে সত্য। আমার কাছে সত্য—অর্থাৎ যে অবস্থায় আমি দ্রষ্টা, সেই অবস্থায় আমার কাছে সাপটি সত্য। কিন্তু সাপটি নিরপেক্ষ সত্য নয়, অর্থাৎ আমার পরিবর্তে আর কেউ যদি ওটাকে ভিন্নরূপে দেখে বা আমি যদি আলো নিয়ে এসে ওটাকে দড়ি ব'লে দেখি, তাহলে সাপটা আর সত্য থাকে না। সুতরাং অবস্থার পরিবর্তন হ'লে তার সত্যত্বের লোপ হয়। তখনই বলা যায় সাপটা মিথ্যা, তার আগে নয়। যতক্ষণ আমাদের ব্রহ্মানুভূতি না হচ্ছে, ততক্ষণ জগৎটা আমাদের কাছে অবশ্যই সত্য ব'লে গৃহীত হচ্ছে এবং সেই সত্যের নাম আমরা দিয়েছি—'ব্যাবহারিক সত্য'। 'ব্যাবহারিক

বলবার অধিকার আমার নেই। যদি আমি কোন কালে আমার আমিত্বকে বর্জন করতে পারি, যদি কোন কালে আমার ব্যাবহারিক ভূমিকে অতিক্রম ক'রে পারমার্থিক ভূমিতে যেতে পারি—পারমার্থিক তত্ত্বে পৌঁছতে পারি, তখনই মাত্র জগৎটা আমার কাছে মিথ্যা হবে, তার আগে নয়।

জগৎকে স্বীকার করেই শাস্ত্রের বিধিনিষেধ

পরমার্থ-সত্য (Absolute Truth)—সেই সর্ব-অবস্থা-নিরপেক্ষ সত্য যতক্ষণ আমরা অনুভব না করছি, ততক্ষণ এই জগৎটাকে সত্য ব'লে মানতেই হবে, এবং এই ভাবে মানতে হয় বলেই আমরা বলি যে, পরমার্থ সত্যে পৌঁছবার জন্য আমাদের সাধনের প্রয়োজন। যদি জগৎ মিথ্যা হয়, যদি দ্বৈতবুদ্ধি মিথ্যা হয়, তাকে দূর করবার জন্য এত সাধনের প্রয়োজন কি আছে? যখন আমরা জগৎটাকে মিথ্যা বলছি, তখন কোন সাধনের প্রয়োজন নেই, কারণ সাধনও মিথ্যা। এই কথাটি শাস্ত্রকারেরা বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, 'জগৎ যদি মিথ্যা হয়' 'আমি'ই যদি না থাকি, তা হ'লে আর কার জন্য শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের উপদেশ? কিন্তু শাস্ত্র বলছেন যে, এই আত্মতত্ত্বকে জানতে হবে, জানবার জন্য শুনতে হবে। শুনে মনন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। এই যে 'করতে হবে' বলা হচ্ছে, কার জন্য বলা হচ্ছে? কে করবে? যদি ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকে, তাহলে আর উপদেশ কার জন্য? কে বা উপদেশ করছে, কার জন্যই বা উপদেশ? সুতরাং এইভাবে জগৎটাকে কখনো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জগৎটাকে সত্য ব'লে মেনে নিলেই শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ সঙ্গত হয়। 'এটা করবে, ওটা করবে না', 'এটা ভাল, ওটা মন্দ'—এ-সব কথা তখনই অর্থবহ হয়। গীতা বলছেন, 'হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে' (১৮।১৭)—জগতের সমস্ত প্রাণীকে হত্যা

করলেও তিনি হত্যাকারী হন না, বা হত্যাক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হন না। কারণ তাঁর কোন কর্ম নেই—তিনি পারমার্থিক সত্যকে জেনেছেন, নিজেকে শুদ্ধ নিষ্ক্রিয় আত্মা ব'লে অনুভব করেছেন। এই যে কথাটি বলা হ'ল, এই কথাটি অবলম্বন ক'রে তাহলে আমরা কি যেমন খুশী ব্যবহার ক'রব? তাহলে তার পরিণাম কি হবে?—না, নীতি-ধর্ম এগুলি সব বৃথা হ'য়ে যাবে। এদের কোন প্রয়োজন, কোন অর্থ থাকবে না। তাই শাস্ত্র বলছেন, যতক্ষণ 'তুমি' আছ, তোমার ব্যক্তিত্ব-বোধ আছে, ততক্ষণ এগুলি সত্য। বন্ধন তোমার কাছে সত্য ব'লে তোমার এই 'সত্য বন্ধন' থেকে মুক্তির জন্য সাধনের প্রয়োজন, কারণ শাস্ত্র তোমাকে এই বন্ধন-মুক্তির উপায় ব'লে দিচ্ছেন। যদি তুমি জীবন্মুক্ত হও, তাহলে এ-সবে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। বেদান্ত বলছেন, 'অত্র···বেদা অবেদাঃ' (বৃহ. উ. ৪।৩।২২), সেই জীবন্মুক্তির অবস্থায় বেদ অবেদ হ'য়ে যায়, অজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়। কারণ তখন আর বেদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কার জন্য বেদ? কে পড়বে? বলবে কাকে? এক আত্মাই যখন আছেন, অন্য কোন তত্ত্বই যখন নেই, তখন কোন ব্যবহারই নেই, শাস্ত্রেরও না।

অধ্যাস ভাষ্য ও মাণ্ডূক্যকারিকা

এইজন্য আচার্য শঙ্কর বলেছেন, 'সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য···নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ' (ব্রঃ সূঃ, অধ্যাস ভাষ্য) এই জগতের সমস্ত ব্যবহার, সত্য এবং মিথ্যাকে মিশিয়ে। সমস্ত ব্যবহার লৌকিক ব্যবহার এবং বৈদিক ব্যবহার দুই-ই—'লৌকিকা বৈদিকাশ্চ সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধি প্রতিষেধমোক্ষপরাণি' (অধ্যাসভাষ্য)। অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞাদি যা কিছু বৈদিক ব্যবহার, খাওয়া-পরা চলা-ফেরা ইত্যাদি যা কিছু লৌকিক ব্যবহার এবং সমস্ত বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্র, মোক্ষশাস্ত্র পর্যন্ত—সবই হচ্ছে সত্য এবং মিথ্যা, এ দুটিকে মিশিয়ে। 'সত্য' মানে যেটি অপরিবর্তনশীল,

আর 'মিথ্যা' মানে সেই সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে রয়েছে যে পরিবর্তনশীল পরিণামী বস্তু। এ দুটিকে এক ক'রে অর্থাৎ অভিন্ন ক'রে, তাদের পার্থক্য বিস্মৃত হ'য়ে আমরা লৌকিক বৈদিক সমস্ত ব্যবহারই ক'রে থাকি।

সেই পরমার্থ-সত্যকে—অপরিবর্তনশীল তত্ত্বকে—লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে, 'ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥' (মাণ্ডুক্যকারিকা, ২।৩২)—পরমার্থ সত্য হ'ল এই যে, নিরোধ অর্থাৎ প্রলয় নেই, উৎপত্তি অর্থাৎ জন্ম নেই, বদ্ধ অর্থাৎ সংসারী জীব নেই, সাধক নেই, মুক্তিকামী নেই, মুক্ত বলেও কেউ নেই। এই পরমার্থ সত্যকে ব্যবহারভূমিতে টেনে নামিয়ে আনা ভ্রান্তিকর। তাতে নানা রকমের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়—এই কথাটি মনে রাখতে হবে। ঠাকুরের কথা ঃ দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে একজন বেদান্তী থাকতেন। তাঁর সম্বন্ধে লোকে নানা রকম অপযশ রটনা করছেন, শুনে ঠাকুর ব্যথিত হ'য়ে তাঁকে বললেন, 'তুমি বেদান্তী, তোমার নামে এ-সব কি শোনা যাচ্ছে?' সাধুটি বললেন, 'মহারাজ, বেদান্ত বলছে—এই জগৎটা তিন কালে মিথ্যা। সুতরাং আমার সম্বন্ধে যা শুনছেন, তাও সব মিথ্যা।' শুনে ঠাকুর যে-ভাষায় ঐ বেদান্তের সপিণ্ডীকরণ করলেন, তা সবাই পড়েছে। নিষিদ্ধ কর্মও করা হচ্ছে, অথচ মুখে বেদান্তের লম্বা লম্বা বুলি—ঠাকুর এর অত্যন্ত নিন্দা করেছেন। কারণ, এই ধরনের বেদান্ত মানুষকে শুধু যে কোন কল্যাণের পথে নিয়ে যায় না, তাই নয়, তার সর্বনাশ পর্যন্ত ঘটায়, কারণ তার 'আমি ব্রহ্ম' বলায়—'আমি'কে সমস্ত বাঁধনের বাইরে বলায়—তার নিরঙ্কুশ ব্যবহার তাকে অধোগামী করে।

তৎ-ত্বম্-পদার্থবিচার

'তৎ-পদার্থ' অর্থাৎ সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম, আর 'ত্বম্-পদার্থ' অর্থাৎ তুমি জীব। এই যে 'তৎ' আর 'ত্বম্', তিনি আর তুমি, এ-সম্বন্ধে বিচার করতে হয়, বিচার ক'রে ক'রে এদের শোধন করতে হয়। অর্থাৎ যে দৃষ্টিতে আমরা এদের বুঝি, সেই দৃষ্টিতে দেখলে হবে না। এর পিছনে আরও তত্ত্ব আছে, সেগুলি বিচার ক'রে ঐ শব্দ দুটির অর্থ ঠিক করতে হয়। 'ত্বং' বা 'তুমি' মানে এই দেহ-ইন্দ্রিয়াদি-অভিমানী জীব। যার অমুক সময় জন্ম হয়েছে, যে এখন যুবা বা প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, যে কিছুদিন পরে মরবে। সেই ব্যক্তি কখনো ব্রহ্ম হ'তে পারে না। ব্রহ্ম সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এই রকম জন্ম-মৃত্যু-জরাগ্রস্ত যে, সে কখনো অব্যয় অপরিণামী কূটস্থ ব্রহ্ম হ'তে পারে না। সুতরাং শাস্ত্র যখন বলছেন, 'তৎ ত্বম্ অসি'—'তুমিই সেই',—তখন বুঝতে হবে 'তুমি' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি। 'তুমি' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে—এইসব দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট ব'লে যাকে বলছি, তার যে পরিবর্তনশীল অংশগুলি, সেগুলিকে বাদ দিলে তার ভিতরে যে অপরিণামী সত্তা খুঁজে পাওয়া যায়, সেই সত্তাটি। আর 'তিনি' বললে সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তার কর্তৃত্ব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ কর্মের উপরে নির্ভর করে। তা না হ'লে তার কর্তৃত্ব কি ক'রে আসে? কিন্তু যিনি কর্তৃত্ব-বিশিষ্ট, তিনি পরিণামী হ'য়ে যান; কর্তা হলেই তাকে পরিণামী বলে। সুতরাং যখন 'তৎ' বা 'তিনি' বলছি, তার মানে 'ঈশ্বর' পর্যন্ত নয়। এর পিছনে, এর পটভূমিকায় কোন একটি অপরিণামী সত্তা আছেন, যিনি কিছুই করছেন না, সৃষ্টি স্থিতি লয়—কোন কাজই যিনি করছেন না। তাঁকেই 'তৎ' বা 'তিনি' ব'লে লক্ষ্য করা হয়েছে। সুতরাং 'তৎ' পদ এবং

যায় না। একটি থেকে আর একটিকে পৃথক্ করবার মতো কোন ধর্ম সেখানে আর থাকে না। তাই এই দুটিকে এক বলা হয়েছে, দুটি ভিন্ন নয়, বলা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ব্যবহারক্ষেত্রে দ্বৈতভাব

এই যে অভেদ-জ্ঞানের কথা বলেছে, সেই অভেদ কখনো এই ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে হ'তে পারে না, এ-কথা শাস্ত্র বার বার বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এই অভেদত্ব মানলে বেদান্তের অপব্যবহার হয়, যার নিন্দা ঠাকুর করেছেন। যারা বেদান্তের অপব্যবহার করে, তাদের 'হঠবেদান্তী' বলে—জোর ক'রে বেদান্তী হওয়া। শাস্ত্র মানুষকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন,—তোমরা যেন এই রকম 'হঠবেদান্তী' হ'য়ো না। ঠাকুর বলছেন, তার চেয়ে পার্থক্য থাকা ভাল। বলছেন, তার চেয়ে তিনি আর আমি ভিন্ন, আমি দাস তিনি প্রভু, আমি তাঁর সন্তান, তিনি আমার পিতা, মাতা—এই রকম বুদ্ধিতে পার্থক্য রেখে মানুষ এগোতে পারে।

প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্য

শাস্ত্র যখন অভেদ-জ্ঞান করতে বলেছেন, তখন ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে যে ভেদ, তাকে অস্বীকার ক'রে নয়। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে, সোনার যা কিছু, তা সবই সোনা। যেমন সোনার ঘটি, সোনার বাটি, সোনার হাতী,—এগুলি সব সোনা। কিন্তু সোনার ঘটি আর সোনার হাতী দুটো এক হয় না কখনো। পঞ্চভূত দিয়ে সবই হয়েছে; বালিও হয়েছে, তিলও হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা তেল বার করবার জন্য চেষ্টা করি, তখন বালি পিষে তেল বার করতে পারি না, তিলকে পিষে

কিন্তু তা তো কখনো হয় না! ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন পার্থক্য আছে, সেটি রাখতেই হয়। আমরা ব্যবহারকে কখনও ঐ ভাবে 'ন স্যাৎ' করতে পারি না। যাঁরা বলেন সবই ব্রহ্ম, তাঁদের কাউকে খাবার সময় যদি ঐরকম এক রাশ বালি পাতে দেওয়া যায় এই ব'লে যে, অন্নও ব্রহ্ম, বালিও ব্রহ্ম; সুতরাং এক থালা বালি দিলাম, খাও তুমি এখন, তাহলে অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায়! যখন আমরা সবই ব্রহ্ম বলি, তার তাৎপর্য ব্যবহারেতে কখনও নয়। ব্যবহারের পিছনে যে তত্ত্ব রয়েছে অব্যবহার্য, ব্যবহারের অতীত, যা সমস্ত বিক্রিয়ারহিত, যা কখনও কোনরকম পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, সেই তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দিয়েই আমরা সব ব্রহ্ম বলি, ব্রহ্ম আর জীব অভেদ বলি। তা না হ'লে জীব—যে জীবকে আমরা অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্ দেখি, আর ঈশ্বর যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন, এ দুটি কখনও অভিন্ন হয় না। যদি অভিন্ন হ'ত তাহলে জীবই জগৎ সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু জীব তা কখনও পারে না। কারণ, সে অল্পশক্তিমান্। জীবের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলছেন, 'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ॥' (শ্বেতা. উ. ৫।৯) জীব কি রকম? —না, একটি চুল, তাকে একশ' ভাগ ক'রে তার একটি ভাগ নিয়ে তাকে আবার একশ' ভাগ করলে যেটি হয়, সেটি যেন একটি জীব। সুতরাং এই বিরাট জগতে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীব কতটুকু? ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর চেয়েও অণু। সেই জীব যদি বলে, 'আমি ব্রহ্ম', তাহলে একেবারে উন্মত্তের প্রলাপের মতো হয়।

সুতরাং এই ভাবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' হয় না। আমার পিছনে যে অবিকারী সত্তা রয়েছে, যে সত্তা থাকার জন্য আমার সমস্ত ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে, যাকে অবলম্বন ক'রে আমি অস্তিত্ব-বিশিষ্ট—আমি রয়েছি, আমি

হচ্ছে না, অথচ বলছি, 'আমি ব্রহ্ম।' অযথা মুখে আমরা বলি 'আমি ব্রহ্ম।' ঠাকুর বলেছেন, "কাঁটা নেই, খোঁচা নেই, মুখে বললে কি হবে! কাঁটায় হাত পড়লেই কাঁটা ফুটে উঃ' ক'রে উঠতে হয়।" আমি শরীর নই, দেহধারী জীব নই, এ-রকম মুখে বলছি। কিন্তু প্রতি পদে আমাদের অনুভব করিয়ে দিচ্ছে—আমি দেহধারী, আমি জরা-মরণগ্রস্ত, সর্বপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ। সেই আমিকে নিয়ে বলছি, আমি এ-সব বন্ধনাদি থেকেমুক্ত। এ-কথা বলা পাগলের মতো বলা। একজন পাগলকে দেখেছি সে বলছে, 'আমি অমুক রাজ্যের মহারাজা' আর এক টুকরো কাগজে লিখে এক ব্যক্তিকে বলছে, 'এই তোমাকে একটা চার লাখ টাকার চেক দিলুম, ভাঙিয়ে নাও।' অথচ ব্যাঙ্কে তার কিছুই নেই। একেই বলে পাগল। যে কেবল আবোল-তাবোল কথা বলে, যার কথার সঙ্গে বাস্তবের কোন সঙ্গতি নেই, তাকে বলে পাগল। সুতরাং তত্ত্বের উপলব্ধির ঘরে যদি আমাদের শূন্য থাকে, অথচ আমরা মুখে বলি, 'আমি ব্রহ্ম', সেটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি মর্মে মর্মে বুঝি, আমি দেহধারী জীব, দুদিন আগে জন্মেছি, দুদিন পরে ম'রব, আর সারা জীবন সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ, অথচ মুখে বলছি, 'আমি ব্রহ্ম'—এটা পাগলের কথা! ঠাকুর বার বার বলছেন, এ-রকম মিথ্যা অভিমান ভাল নয়। কেন? না, তাহলে তার উন্নতির আর কোন পথ রইল না। যে উন্নতিটাকে পাগলামির দরুন আমরা মিথ্যা বলছি, তার জন্য চেষ্টা থাকে না। মিথ্যা বস্তুর প্রাপ্তির জন্য কখনও আকাঙ্ক্ষা হয় না মানুষের। সুতরাং ব্রহ্মানুভূতির পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়।

জগতের মিথ্যাত্ব—চরম অনুভূতিসাপেক্ষ

বোধ করি। ঘুম ভেঙে উঠে আমরা স্বপ্নটাকে মিথ্যা বলি। কিন্তু যতক্ষণ স্বপ্নের ভিতর আছি, স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুগুলি—জাগ্রৎ অবস্থায় দৃষ্ট বস্তুগুলির মতোই সত্য মনে হয়, তার চেয়ে কম নয়। জেগে উঠলেই স্বপ্নের জিনিসগুলি মিথ্যা ব'লে জানতে পারা যায়, তখন স্বপ্নাবস্থাকে 'মিথ্যা,' বলা যায়। ঠিক সেই রকম জাগ্রৎ অবস্থাকে 'মিথ্যা' বলতে হ'লে আমাদের জাগ্রতের চেয়ে আরও একটি উচ্চতর অবস্থায় উঠতে হবে। তখনই আমরা বুঝতে পারব যে জাগ্রৎ অবস্থাটাও মিথ্যা এবং তখনই তাকে 'মিথ্যা' বলার অধিকার হবে। যতক্ষণ আমরা এই জাগ্রতের ভিতরে রয়েছি, জাগ্রৎ অবস্থাকে মিথ্যা বলবার কোন অধিকার নেই আমাদের। তবে শাস্ত্র বা আচার্যেরা 'জগৎ মিথ্যা' বলছেন কেন? বলছেন এই জন্য যে, জগতের অতীত তত্ত্বে আরোহণ করবার জন্য আমাদের পক্ষে এই উপদেশটি প্রয়োজন। বোবায় ধরলে ঘুমন্ত লোককে ডেকে জাগিয়ে দিতে হয়, ঠিক সেই রকম শাস্ত্র আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় নাড়া দিয়ে বলেন, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।' তোমরা ঘুমোচ্ছ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছ, তোমরা ওঠ, জাগো। শাস্ত্র বা আচার্যেরা বলছেন না, 'তুমি কল্পনা করো, জগৎটা মিথ্যা।' এই কল্পনা কোন দিন আমাদের জগৎটাকে মিথ্যা ব'লে বোধ করাতে পারবে না। জগতের অতীত তত্ত্বে না পৌঁছানো পর্যন্ত, ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপরোক্ষ অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত, এই জগৎটা এখন যেমন সত্য, আজ যেমন সত্য, কাল তেমনি সত্য থাকবে। সুতরাং জগৎটাকে ব্যবহার-ভূমিতে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই ঠাকুর বলছেন, যে ঐ ভাবে উড়িয়ে দেয়, তার কথাটাও উড়িয়ে দেবার মতো হয়। অতএব ঐ ধরনের বেদান্তবুলির ঠাকুর নিন্দা করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা ও ব্যাখ্যা

তারপর ঠাকুর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। দৃষ্টান্তটিও খুব সুন্দর। বলছেন, "কি রকম জানো? যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না। কাঠ পোড়ালে তবু ছাই,বাকী থাকে।" 'কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না' অর্থাৎ ভাব হচ্ছে এই যে, আমাদের উপাধিগুলি, আবরণগুলি, সরাতে সরাতে কি বাকী থাকে শেষ পর্যন্ত? ঠাকুর বলছেন কিছুই বাকী থাকে না। কিছুই বাকী থাকে না মানে কি? শূন্য হ'য়ে যায়? ঠিক তা নয়। আমাদের এই যে আমি' যে 'আমি'কে নিয়ে সর্বদা ব্যবহার করছি সেই 'আমি'র ভিতরে পরিণামী বস্তু যেগুলি, যেগুলি বদলে বদলে যাচ্ছে, সেগুলিকে এক এক ক'রে সরিয়ে দিলে বাকী কি থাকে? বাকী থাকে একটি জিনিস। বাকী থাকে সে নিজে যে সরিয়ে দিল। আমি উপাধিগুলোকে এক এক ক'রে সরালাম, কিন্তু আমাকে আমি কি ক'রে সরাবো? এক এক ক'রে আমি আমার উপরে যত আবরণ সব সরালাম, কিন্তু একটি তত্ত্ব রইল, সে তত্ত্বকে আর সরাবার কেউ রইল না। ভাব হচ্ছে এই যে, জীব যখন সমস্ত আবরণ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে ব্রহ্মের মতো অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় হয়—ব্রহ্মস্বরূপ হয়। তখন আর তার জীবত্বের কিছু অবশিষ্ট থাকে না। স্বামীজী এই বেদান্তেরই কথাটি বলেছেন—তাঁর ভাষায়: "'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।" 'এ নয়, এ নয়' ক'রে চলতে চলতে শেষে যেখানে এসে মানুষ থেমে যায়, সেখানে অবশিষ্ট থাকে 'একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কালহীন, দেশহীন, সর্বহীন' তত্ত্ব, যাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়, যিনি জীবের প্রকৃত স্বরূপ!

অধ্যারোপ-অপবাদ

এই যে শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে এক এক ক'রে সরানো, একে বলে অপবাদ—'অধ্যারোপের অপবাদ'—আমার উপরে যা কিছু আরোপিত

হয়েছে, যে সব আবরণ এসে পড়েছে, সেই সব আবরণ বা আরোপিত বস্তু সরিয়ে দেওয়া। যেন আত্মার উপরে কতগুলি খোলস চাপা দেওয়া হয়েছে, সেই খোলসগুলিকে এক এক ক'রে সরিয়ে দিতে হয়। তারপর সরাতে সরাতে আর যখন সরাবার কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, তখন যা রইল তা-ই থাকে। কিছু রইল না, এ-কথা বলা যায় না। নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর বহু জায়গায় এই জিনিসটি—বেদান্তের এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি—বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছুই বাকী থাকে না, এই কথা বলেছেন। সেই রকম উপাধিগুলি ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না, যা ছাড়ানো যায়। কিন্তু অবশিষ্ট থাকে না মানে হচ্ছে, এমন কিছু থাকে না, যা সরানো যায়। 'এটা আমি নয়', 'এটা আমি নয়' বলতে বলতে, যেখানে আর নিষেধ করবার কিছু বাকী থাকে না—নিষেধের শেষ যেখানে, সেখানে আর কোন শব্দাদির দ্বারা ব্যবহার সম্ভব নয়। তাকে শব্দ দিয়ে উল্লেখ করা যায় না। তাকে বর্ণনা করা যায় না। কে বর্ণনা করবে? ঠাকুর বলেছেন: নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল, গিয়ে সমুদ্রে গলে গেল। সমুদ্র কেমন—আর কে খবর দেবে? নুনের পুতুল—শব্দটি লক্ষ্য করবার মত—মানে নুনটি পুতুলের স্বরূপ। নুনই তার সব, কেবল একটা আকার আছে। সমুদ্র, তারও স্বরূপ নুন। নুনের পুতুল সমুদ্রে নামল সমুদ্রকে মাপবে ব'লে। কত জল, ভিতরে কি আছে দেখবে ব'লে। কিন্তু মাপতে গিয়ে সে গলে গেল। সমুদ্রের সঙ্গে তার আকারগত যে একটা পার্থক্য ছিল, সেই পার্থক্যটি দূর হ'য়ে গেল। আর খবর দেবে কে? জীব যখন ব্রহ্মের অনুসন্ধান করতে করতে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নতা বুঝাবার মতো তার যে ধর্মগুলি ছিল, যে রূপগুলি ছিল, যে বিশেষণগুলি ছিল, সেগুলি থেকে এক এক ক'রে মুক্ত হ'য়ে গেল, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ আর কে বলবে?

উপনিষদ্বাক্য-জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা

'যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥' (কঠ. উ ২।১।১৫)

—যেমন একবিন্দু শুদ্ধ জল শুদ্ধ জলরাশির ভিতরে পড়ে সেই জলরাশির সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে যায়, তদ্রূপ হ'য়ে যায়, সেই রকম জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মাও ব্রহ্মাভিন্ন হ'য়ে যায়—ব্রহ্মরূপ হ'য়ে যায়। অর্থাৎ তাঁর আর সেই ব্রহ্মবস্তু থেকে পৃথক্ করবার মতো কোন ধর্ম (বৈশিষ্ট্য) অবশিষ্ট থাকে না। তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে যান। এই অভিন্নতা কিন্তু অর্জিত নয়। আবরণ-গুলি সরানো হয় ব'লে, পোশাক ছাড়ার মতো আরোপিত বস্তুগুলি এক এক ক'রে সরাতে হয় ব'লে—এ-কথা বলা চলে না যে, জীব ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা অর্জন করে। যেমন দৃষ্টান্ত আছে: কলসী সমুদ্রে ডোবানো আছে। সমুদ্রের ভিতরে কলসীটি সম্পূর্ণ ডোবানো আছে। আমরা বলি বটে সমুদ্রের জল আর কলসীর জল। আসলে কলসীতে যে জল, সমুদ্রেও সেই জল। কলসীর যে আকারটা, তা যেন সমুদ্রের জলটাকে কলসীরূপেতে আকারিত করছে। কলসীটাকে যদি ভেঙে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ কলসীর জলটার কি হয়? সমুদ্রে মিশে যায়? সে তো মিশেই ছিল! সে তো কোন দিন সমুদ্রের জল থেকে পৃথক্ ছিল না—সমুদ্রের জল আর কলসীর জল তো সর্বদাই এক হ'য়ে ছিল। আমরা কেবল তার আবরণের জন্য তাকে পৃথক্ ব'লে মনে করছিলাম। বিচারের দ্বারা আমাদের সেই পার্থক্যবোধটা দূর হ'য়ে যায়। জীবেরও ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ-প্রাপ্তি মানে যে পার্থক্যবোধটা তার মনে রয়েছে, যার ফলে তার 'আমি' দানা বেঁধেছে, সেই পার্থক্যবোধটার লোপ হওয়া —কিছু অর্জন করা নয়। তখন যা ছিল, তা-ই থাকে।

LIBRARY